বাণিজ্যিক চিংড়ি চাষ, বিপন্ন পরিবেশ ও দরিদ্রদের জীবন জীবীকা[1]

ড. আবুল বারকাত

উপকূল ও বাণিজ্যিক চিংড়ি চাষ

দেশের প্রায় ৩২ লাখ হেক্টর উপকূল অঞ্চলের ২০ লাখ হেক্টর চাষযোগ্য। এসব অঞ্চলের বিস্তৃতি চারটি agro-ecological zone -এর ১৫[2] জেলার ৯৮টি উপজেলায়। সমুদ্রের জোয়ার-ভাটা ও লবণাক্ততা দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় উপকূলীয় অঞ্চলের প্রধান দু'টি বৈশিষ্ট্য। দেশের মোট ১৪ কোটি জনসংখ্যার ২ কোটির বসবাস উপকূলীয় অঞ্চলে।

উপকূলের মোট জমির ১০ লাখ হেক্টর এপ্রিল থেকে নভেম্বর মাসে প্রত্যেক দিন জোয়ার-ভাটার আওতায় থাকে; শুষ্ক মৌসুমে লবণাক্ততা বাড়ে; জমি লবণাক্ত হয়ে পড়ে। এসব কারণে উপকূল অঞ্চলে ফলনের তীব্রতা স্বল্প– চট্রগ্রাম অঞ্চলে ৬২% আর পটুয়াখালী অঞ্চলে ১১৪% (যেখানে জাতীয় গড় প্রায় ২০০%)।

বন্যা আর লবণ পানি থেকে রক্ষার জন্য উপকূলীয় দক্ষিণাঞ্চলে সরকারি উদ্যোগে বাঁধ নির্মাণ (পোল্ডারসহ) কাজ শুরু হয় ষাটের দশকে। ফলশ্রুতিতে অভ্যন্তরীণ (দেশজ) মৎস্য সম্পদ বিনষ্ট হয়; ফসল উৎপাদন ব্যাহত হয়; চিংড়িসহ মিঠাপানি ও লবণ পানির প্রাকৃতিক মৎস্য বিচরণ ও বংশ-বিস্তার ক্ষেত্রসমূহ সঙ্কুচিত হয়। আর সত্তরের দশকে আন্তর্জাতিক বাজারে চিংড়ি (গলদা ও বাগদা) মাছের চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে পোল্ডারে চিংড়ি চাষ বৃদ্ধি পায়। পোল্ডারে জলাবদ্ধতার কারণেও চিংড়ি চাষ বৃদ্ধি পায়। সেইসাথে ১৯৮০-৮৫-এর পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় চিংড়ি চাষকে যখন শিল্প হিসেবে ঘোষণা দেয়া হল সাথে সাথে চিংড়ি চাষ ও সংশ্লিষ্ট ব্যবসা প্রাতিষ্ঠানিক প্রণোদনা পাবার কারণে উচ্চ মুনাফার ব্যবসায় রূপান্তরিত হল। অতএব একদিকে বন্যা নিয়ন্ত্রণের নামে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ (৬০-৭০ দশকে), আর অন্যদিকে ভাল-মন্দ বিচার না করে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (৮০-৮৫ সালে) চিংড়ি চাষকে শিল্পের মর্যাদা দেয়ার ফলে ঘটে গেলো অঘটন– সৃষ্টি হ'ল দরিদ্র জনগোষ্ঠির সীমাহীন দুর্দশার বিস্তৃত ক্ষেত্র।

সালওয়ারি চিংড়ি মাছের উৎপাদন প্রবণতা বিষয়টি আরো স্পষ্ট করে। ১৯৭৯-৮০ সালে এ দেশে মাত্র ২০,০০০ হেক্টর জমিতে চিংড়ি চাষ হতো। ১৯৮৮-৮৯ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১০৮,০০০ হেক্টরে; ১৯৯৩-৯৪-এ ১৩৮,০০০ হেক্টরে; আর ১৯৯৬-৯৭-এ ৪১০,০০০ হেক্টরে। বাংলাদেশে প্রবৃদ্ধির এ গতি অন্য কোনো সেক্টরে পাওয়া যাবে না। মাস্টার প্লান অর্গানাইজেশন (MPO) প্রক্ষেপণ করেছিল যে ২০০৫ সাল নাগাদ ১৩৫,০০০ হেক্টরে চিংড়ি চাষ হবে অথচ বাস্তবে দেখছি ১৯৯৩-৯৪ সালে ১৩৮,০০০ হেক্টরে চিংড়ি চাষ হয়েছিল। আর ১৯৯৬-৯৭ সালে চিংড়ি চাষের আওতায় এসেছে ২০০৫-এর জন্য প্রক্ষেপিত জমির তিনগুণ বেশি। চিংড়ির মোট উৎপাদন আর হেক্টরপ্রতি উৎপাদন উভয়ই অনুরূপ বেড়েছে (সারণি-৪২)। অর্থনৈতিক লাভ-ক্ষতির বিবেচনায় দেশজ ও আন্তর্জাতিক বাজারে নিশ্চয়ই বড় মাপের কিছু একটা ঘটেছে যার ফলই হ'ল অনাকাঙ্খিত এ প্রবৃদ্ধি। কার লাভ আর কার ক্ষতি হয়েছে বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বসহ বিবেচনা করা প্রয়োজন (এ বিষয়ে পরে আলোচনা আছে)।

---

[1] নিজেরা করি (পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি) আয়োজিত "সন্ত্রাস নির্ভর বাণিজ্য, গণতন্ত্র ও দরিদ্রদের অধিকার" শীর্ষক দু'দিনব্যাপী কর্মশালার জন্য রচিত, ঢাকা: ৪ এপ্রিল ২০০৪এ

[2] বাগেরহাট, বরগুণা, বরিশাল, ভোলা, চাঁদপুর, চট্রগাম, কক্সবাজার, ফেনি, ঝালকাঠি, খুলনা, লক্ষীপুর, নোয়াখালী, পটুয়াখালী, পিরোজপুর ও সাতক্ষিরা।

সারণি ৪২: চিংড়ি চাষ– ঘেরের সংখ্যা, জমি, উৎপাদন, উৎপাদনশীলতা: ১৯৯৭

সাল	ঘেরের সংখ্যা	জমি (হেক্টর)	উৎপাদন (মে:টন)	উৎপাদনশীলতা (হেক্টর প্রতি কি:গ্রাম)
১৯৮৩-১৯৮৪	৩,১৭১	৫১,৮১২	৪,৩৮৬	৮৫
১৯৮৪-১৯৮৫	৩,১৭১	৬৪,২৪৬	৭,৫৭৮	১১৮
১৯৮৫-১৯৮৬	৩,১৭১	৮৭,৩০০	১৪,৬৫৮	১৬৮
১৯৮৬-১৯৮৭	৩,৭৭৮	৮৭,৩০০	১৪,৭৭৩	১৬৯
১৯৮৭-১৯৮৮	৩,৭৭৮	৯৪,০১০	১৭,৮৮৯	১৯০
১৯৮৮-১৯৮৯	৩,৭৭৮	১০৮,২৮০	১৮,৬২৫	১৬৯
১৯৮৯-১৯৯০	৬,৫৮১	১০৮,২৮০	১৮,৬২৪	১৭২
১৯৯০-১৯৯১	৬,৫৮১	১০৮,২৮০	১৯,৪৮৯	১৮০
১৯৯১-১৯৯২	৬,৫৮১	১০৮,২৮০	২০,৩৩৫	১৮৮
১৯৯২-১৯৯৩	৬,৫৮১	১০৮,২৮০	২৬,০০০	২৪০
১৯৯৩-১৯৯৪	৬,৫৮১	১৩৭,৯৯৬	২২,০৫৪	১৬০
১৯৯৪-১৯৯৫	৬,৫৮১	১৩৭,৯৯৬	২৬,২৭৭	১৯০
১৯৯৫-১৯৯৬	৬,৫৮১	১৩৭,৯৯৬	৬৮,০০০	৪৯২
১৯৯৬-১৯৯৭	৬,৫৮১	৪১০,০০০	১১৫,০০০	৮২১

উৎস: আ. বারকাত ও পি.কে. রায়: ২০০৩ (Barkat A and PK Roy, "Bangladesh: Community-based Property Rights and Human Rights, An overview of resources, and legal and policy developments", Isabel de la Torre and David Barnhizer, eds., *The Blues of a Revolution: The Damaging Impacts of Shrimp Farming*, The Industrial Shrimp Action Network and the Asia Pacific Environmental Exchange, 2003, ISA Net, WA, USA).

বাণিজ্যিক চিংড়ি চাষ ও পরিবেশ

আমাদের দেশে চিংড়ি চাষের শুরুটা হয়েছিল খানা ভিত্তিক। ব্যবহৃত হতো পতিত জমি ও পুকুর। পারিবারিক আয়ে নূতন-উৎস থেকে কিছুটা আয় সংযোজন ছিল উদ্দেশ্য। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা বৃদ্ধি ও মূল্য বৃদ্ধির সাথে সাথে হুড়হুড় করে বাড়লো বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চিংড়ি চাষ। মুনাফা, আরো মুনাফা– মানলো না কোন বাধা। ফলে নির্বিচারে চিংড়ি চাষের আওতায় চলে আসলো অতীতের সু-ফসলী ধানী জমিসহ উপকূলীয় এলাকার বাঁধের ভিতরের আর বাইরের সকল জমি, লবণ-উৎপাদনের জমি, পরিত্যাক্ত ও প্রান্তীয় জমি, ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল, আর্দ্রভূমি ইত্যাদি। অপরিকল্পিত ও বিষ্ফোরণমূলক এ প্রবৃদ্ধি নির্বিচারে ধ্বংস করলো প্রকৃতি-পরিবেশ-প্রতিবেশ সবকিছুই: পানির গুণগত মান লোপ পেল; জীব বৈচিত্র হল বিনষ্ট; গাছ-পালা ফলমূল-এর স্বাভাবিক প্রাকৃতিক বিকাশ রূদ্ধ হ'ল; লবণাক্ততা বিনষ্ট করলো জমির প্রাকৃতিক গুণাবলী; হাঁস-মুরগীসহ গো-সম্পদ বিলুপ্ত প্রায়।

চিংড়ি চাষের কারণে উষ্ণমণ্ডলীয় বনাঞ্চল, মানুষের বাড়ী-ঘরের চারপাশের গাছপালা, শাকশবজি চাষ, কৃষি-বন, প্রাকৃতিক গাছ-গাছালি যেমন দুর্বা, পটি, বাজুয়া এসব বিলুপ্তির সকল শর্ত সৃষ্টি করা হয়েছে। সুন্দরবনের জীব-বৈচিত্র বিনষ্টের কারণে বন সঙ্কোচন হচ্ছে। প্রায় ৬০,০০০ হেক্টর ম্যানগ্রোভ বন বিনষ্ট করে সেখানে চিংড়ি চাষ হচ্ছে। খোসাওয়ালা মাছের প্রাকৃতিক বিচরণ ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হচ্ছে; বিলুপ্ত হচ্ছে সামুদ্রিক কচ্ছপ, ডলফিন, শম্বুক, জলজ উদ্ভিদ (পটি, বাজুয়া, শাপলা, হেলেঞ্চা, মালঞ্চ, কলমি, থানকুনি, আজবালি ইত্যাদি); সেই সাথে ব্যাপক হারে হ্রাস পাচ্ছে দেশান্তরীত পাখির আগমন; বিভিন্ন ধরণের গাছপালা দ্রুতালয়ে কমে আসছে (যেমন আম, কাঁঠাল, জাম, লেবু, পেঁপেঁ, নারকেল, সুপারি, পিয়ারা, বাবলা ইত্যাদি); লবণাক্ততার কারণে বসত-বাড়ী সংলগ্ন শাক-শবজির চাষ হ্রাস পাচ্ছে; কৃষিজ ফসল ধান-পাট-আখের উৎপাদন ব্যাপক হারে হ্রাস পাচ্ছে।

উপকূলীয় অঞ্চলে অতীতে গো-সম্পদ আর হাঁস- মুরগী পালনের অবস্থা কেমন ছিল সে সম্পর্কে জরিপ ভিত্তিক কোনো তথ্য নেই। তবে এলাকা ঘুরে আমরা জানতে পেরেছি যে ৮০% খানায় এসব সম্পদ আগের তুলনায় অনেক কমেছে। কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে চিংড়ি চাষের জন্য জমি প্লাবিত করার ফলে গো-চারণ ক্ষেত্র সঙ্কোচন, খাবার পানির অভাব, চিংড়ি ঘেরে হাঁসের অনুপ্রবেশে নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদি। এসবই উপকুলীয় অঞ্চলে ২ কোটি মানুষের খাদ্যাভ্যাসে প্রোটিন-এর ঘাটতি বৃদ্ধি করেছে।

চিংড়ি চাষের অঞ্চলে জমির লবণাক্ততা দানাদার ফসলের উৎপাদনশীলতা হ্রাস করেছে। জমিতে মাত্রাতিরিক্ত লবণের উপস্থিতি ফলন-বৃদ্ধি চক্রের ওপর মারাত্মক ঋণাত্মক প্রভাব ফেলেছে। শুধু মাত্র একর প্রতি ফলনই হ্রাস পায়নি, এমনও হয়েছে যখন পুরো ফসলই মারা গেছে। ফারাক্কা বাঁধ আর সেই সাথে শুস্ক মৌসুমে গঙ্গার পানির গতিপথ পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রের লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ বৃদ্ধির ফলে উপকূলীয় কৃষি জমিতে অম্লের (acid) পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে, লবন-পানির জলাবদ্ধতা বেড়েছে এবং কাদামাটির গুণাগুণ লোপ পেয়েছে। এসবই ফসল উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত করেছে। ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠির খাদ্য নিরাপত্তা পড়েছে হুমকির মুখে।

চিংড়ি চাষের ফলে উপকূলীয় অঞ্চল জুড়ে পানির ফিজিক্যাল, কেমিক্যাল ও বায়োলজিক্যাল গুণাবলী পরিবর্তিত হয়েছে। দীর্ঘস্থায়ী লবণাক্ততার কারণে পানির p^H মাত্রার এমন পরিবর্তন ঘটেছে যা খাবার পানি, বাহ্যিক ব্যবহারের জন্য পানি, সেচের জন্য পানি, জীব-জন্তুর জন্য পানি– সবকিছুকেই পাল্টে দিয়েছে। আর দূষিত পানির পুনঃব্যবহার পানির দূষণ মাত্রা বাড়িয়েছে। এককথায় বিপন্ন হয়েছে হাজার বছরের প্রকৃতি ও পরিবেশ।

বাণিজ্যিক চিংড়ি চাষ ও দরিদ্র মানুষের জীবন-জীবিকা

উপকুলীয় অঞ্চলে চিংড়ি চাষ যে ব্যাপক ও ক্রমবর্ধমান হারে পরিবেশ বিনষ্ট করার মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠির জীবন-জীবিকার ওপর ঋণাত্মক প্রভাব ফেলেছে সে কথা ইতোমধ্যে বিশ্লেষণ করেছি। এখানে উল্লেখ করা উচিত যে ঐ কু-প্রভাব বংশ-পরম্পরা (intergeneratioal)।

চিংড়ি ঘেরের মালিকেরা দৌর্দণ্ড প্রভাবশালী। চিংড়ি ঘের-এর জমির মালিকানা হয় ব্যক্তিমালিকানাধীন অথবা সরকারি মালিকানাধীন (খাস)। ব্যক্তিমালিকানাধীন ঘেরে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জমির প্রকৃত মালিক প্রান্তিক অথবা ক্ষুদ্র কৃষক, যার কাছ থেকে ঘেরের প্রভাবশালী মালিক চুক্তি ভিত্তিতে জমি নিয়ে থাকেন। অনেক ক্ষেত্রেই প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষক এসব চুক্তি করতে বাধ্য হন। বৃহৎ চিংড়ি ঘেরের মালিকেরা একই সময় অনেকের সাথে ২-৭ বছরের মেয়াদে চুক্তিবদ্ধ হন। বাৎসরিক চুক্তির আর্থিক মুল্যমান (হারা = contract money for leasing of land) একর প্রতি ৪,০০০-৬,০০০ টাকা। আধা-নিবিড় (semi-intensive) চিংড়ি ঘেরে বৎসরে উৎপাদন ব্যয় হয় ৭৬,০০০ টাকা আর গড় নীট-মুনাফা হয় ২৬২,০০০ টাকা (সারণি ৪৩)। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে গড়ে একজন চিংড়ি মালিক বছরে একর প্রতি পাচ্ছেন ২০০,০০০ টাকা কিন্তু জমির মালিক (প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষক) পাচ্ছেন মাত্র ৪০০০-৬০০০ টাকা। অনেক ক্ষেত্রেই ঘের মালিক কর্তৃক জোরপূর্বক অন্যের (প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকের) জমি দখল এবং/অথবা নাম মাত্র হারা (চুক্তির অর্থ) প্রদান না করার কারণে সংঘর্ষ-সংঘাত, মামলা-মোকাদ্দমার সূচনা ঘটে। একদিকে মামলা-মোকদ্দমার ব্যয়ভার বহন আর অন্যদিকে আয়-মূলক কর্মকাণ্ড থেকে ইস্তফা দিতে বাধ্য হবার কারণে দরিদ্র-প্রান্তিক-ক্ষুদ্র কৃষক পরিবার পরিচালনে চড়া সুদে ঋণ নিতে বাধ্য হন। ফলে ভূমিহীনতার প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত হয় সম্পদ হারানোর প্রক্রিয়া– এসব মানুষ নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর হয়ে ভিক্ষুকে রূপান্তরিত হন। নিজ মালিকানাধীন জমির ওপর আইন সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে শরিক হতে বাধ্য হন দরিদ্র-প্রান্তিক-ক্ষুদ্র কৃষক। এ লড়াইয়ে ঘের মালিকেরা প্রায়শই সশস্ত্র-পেশী শক্তি ব্যবহার করেন; ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলসহ থানা-পুলিশ কোর্ট-এর ওপর অন্যায় প্রভাব বিস্তার করেন। খুন-জখম-গুম-এর শিকার হ'ন দরিদ্র-প্রান্তিক-ক্ষুদ্র জমির মালিক।

অনেকেই এ প্রক্রিয়ায় নিজ এলাকা ত্যাগ করে দুর্বিষহ জীবন গ্রহণে বাধ্য হন। আবার ক্ষেত্র বিশেষে ক্ষুদ্র মালিকেরা যখন জমির ঋতু-ভিত্তিক লিজ দেন (অথবা দিতে বাধ্য হন; জানুয়ারী থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত) তখন লিজ পরবর্তী কয়েকমাসে কৃষিতে ধান উৎপাদনের চেষ্টা করলেও জমির প্রাকৃতিক উর্বরতা হ্রাসের ফলে ফলন তেমনটি পান না।

এতো গেল নিজ মালিকানাধীন জলা-জমির কথা। এর চেয়েও অনেক ক্ষেত্রেই মারাত্মক হলো সরকারি মালিকানার খাস জমিতে বাণিজ্যিক চিংড়ি চাষের বহুমুখী বিষয়াদি। এক্ষেত্রে ভূমি-প্রশাসন প্রশাসনের অন্য সবার সাথে আঁতাত করে চিংড়ি ঘের মালিকদের কাছে উৎকোচ নিয়ে খাস কৃষি জমির শ্রেণী পরিবর্তন (class change of khas land) করে থাকেন– কৃষি খাস জমি হয়ে যায় খাস জলা যা চিংড়ি চাষের জন্য লীজ পেয়ে যান সম্পদবান-প্রতাপশালী ঘের মালিক; আবার ক্ষেত্র বিশেষে ঐ অশুভ আঁতাতের মাধ্যমে জাল দলিল করে ঘের মালিক বনে যান খাস জলা-জমির মালিক। অর্থাৎ অভিনব এসব পন্থা কার্যকরী হবার ফলে খাস জলা-জমির আইনী মালিক যাদের হবার কথা সেসব ভূমিহীন, দরিদ্র, নিম্নবিত্ত মানুষ সরাসরিভাবেই খাস জমির মালিকানা থেকে বঞ্চিত হ'ন। দরিদ্র মানুষ তার অধিকার নিশ্চিত করার এ লড়াইয়ে নামলে খুন-জখম হ'ন, মামলা-মোকাদ্দমায় জড়িয়ে পড়েন– দরিদ্রদের ভিক্ষুকায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বয়নের এও এক অভিনব পন্থা। সুতরাং অপরিকল্পিত বাণিজ্যিক চিংড়ি চাষ, একদিকে যেমন গুটিকয়েক ঘের মালিকের আর্থিক ধন-সম্পদ বৃদ্ধিতে প্রধান প্রভাবকের ভূমিকা পালন করে, আর অন্যদিকে ব্যাপক দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে জলা-জমির ওপর তাদের ন্যায়সঙ্গত ও অধিকার থেকে বঞ্চিত করে এবং তাদের জীবন-জীবিকাকে করে তোলে অনিশ্চিত।

সারণি ৪৩: একর প্রতি চিংড়ির উৎপাদন ব্যয় ও লাভ

ক্ষেত্র	মোট ব্যয় (টাকা)	মোট রিটার্ণ (টাকা)	নীট রিটার্ণ (টাকা)	মুনাফা হার	এক টাকা বিনিয়োগে রিটার্ণ
শুধু চিংড়ি চাষ (আধা-নিবিড়)	৭৫,৯৮০	৩৩৮,৮৬০	২৬২,৮৮০	৩৪৫	৪.৪৫
চিংড়ি-লবন চাষ	২৮,৫৬৬	৪৫,৬০০	১৭,০৩৪	৫৯	১.৫৯

উৎস: আ. বারকাত ও পি.কে. রায়, ২০০৩: ১৫

বাণিজ্যিক চিংড়ি চাষ উপকূলীয় ব্যাপক জনগোষ্ঠির খাদ্য নিরাপত্তাসহ ব্যক্তিগত জীবনের নিরাপত্তার সকল শর্ত বিলুপ্ত করে। এ প্রক্রিয়া ব্যাপক জনগোষ্ঠির ভিক্ষুকায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করে– এ বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। সাধারণ প্রশাসন, আইন শৃংখলা রক্ষার প্রতিষ্ঠান, বিচার বিভাগ, ভূমি সংক্রান্ত অফিস-আদালত, সন্ত্রাসী বাহিনী ঘের মালিকদের পক্ষ নেবার কারণে উপকূলীয় অঞ্চলের দু'কোটি মানুষের জীবন হয়ে পড়ে দুর্বিষহ। বাণিজ্যিক চিংড়ি চাষ ওভার ইনভয়েসিং (অর্থাৎ কম দামে পণ্য কিনে বেশি দাম দেখিয়ে পুঁজি পাচার) (যন্ত্রপাতি আমদানীর ক্ষেত্রে) ও আণ্ডার ইনভয়েসিং (বেশি পণ্য পাঠিয়ে কম দেশিয়ে কর ফাঁকি) (রপ্তানীর ক্ষেত্রে)-এর মাধ্যমে কাস্টমস ও আয়কর বিভাগকেও দুর্নীতির ফাঁদে ফেলে যারা তারা দুর্বৃত্তায়িত অর্থনীতিতে ইতোমধ্যে অতিরিক্ত মাত্রায় দুর্নীতিগ্রস্ত। সুতরাং শেষ পর্যন্ত বাণিজ্যিক চিংড়ি চাষ এ দেশে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার অন্যতম মাধ্যম হিসেবেই কাজ করছে।

বাণিজ্যিক চিংড়ি চাষ গড়ে তুলছে নীতিহীন-অর্থনীতি

বাণিজ্যিক চিংড়ি চাষ একধরণের নীতিহীন-অর্থনীতি (immoral economics or anti-economics)। অর্থনৈতিক লাভ-ক্ষতির বিবেচনায় অনেকেই (বিশেষত সরকার) মনে করেন যেহেতু বাণিজ্যিক চিংড়ি চাষ সমষ্টিক অর্থনীতিতে বিশেষ ভূমিকা রাখে সেহেতু তা লাভজনক। যুক্তিটা সোজা ও খোঁড়া। বলা হয় বাণিজ্যিক চিংড়ি চাষ যেহেতু জিডিপি'র প্রায় ৫% এবং মোট রপ্তানী আয়ের ৯-১০%– সেহেতু জাতীয় অর্থনীতির বিকাশের স্বার্থে তা জিইয়ে রাখতে হবে। আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি যে এমনকি অর্থনৈতিক লাভ-ক্ষতির মানদণ্ডেও জমির মূল মালিকের ক্ষেত্রে চিংড়ি চাষ শুধু অলাভজনকই নয়, ব্যপক জনগোষ্ঠির নিঃস্বায়ন প্রক্রিয়ার প্রধান অনুঘটকও বটে। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের হিসেব-পত্তরও সেটাই নির্দেশ করে। যেমন হিসেব করে দেখানো হয়েছে যে চিংড়ি চাষ করে এক হেক্টর থেকে বছরে economic return হ'ল ১৬,০০০ ডলার, পক্ষান্তরে ঐ এক হেক্টর থেকে mangrove system-এর return হতে পারে কমপক্ষে ৬১,০০০ ডলার (যার মধ্যে আছে মৎস্য সম্পদ, ঝড়-ঝঞ্ঝা প্রটেকশন, নির্মাণ ও জ্বালানী কাঠ ও অন্যান্য benefit)[৩]। অর্থাৎ এমনকি সরাসরি অর্থনৈতিক লাভ-ক্ষতির নিরিখে বাণিজ্যিক চিংড়ি চাষ ম্যানগ্রোভ সিস্টেমের তুলনায় হেক্টর প্রতি বছরে ৪৫,০০০ ডলার অলাভজনক।

বাণিজ্যিক চিংড়ি চাষ জায়েজ করার জন্য অর্থনীতিবিদদের কেউ কেউ প্রায়ই বাহ্যিকতা (externalities)-র বিষয়টি সযত্নে এড়িয়ে যান। যা কিছু এড়িয়ে যাওয়া হয় অথচ বিজ্ঞানসম্মত economic cost- benefit ও social cost-benefit-এর আওতায় আনা প্রয়োজন (অন্যথায় নীতিহীনতায় দুষ্ট হতে বাধ্য) সেগুলোর অন্তর্ভূক্ত বিষয়াদি নিম্নরূপ। বাণিজ্যিক চিংড়ির বাজার মূল্যে যেসব মূল্য কোনোভাবেই দেখানো হয় না সেগুলো হ'ল:

উপকূলীয় অঞ্চলের ক্ষয়-ক্ষতি (cost of destroyed coastal areas),
বাস্তুচ্যুতির পরিমাণ ও অভিঘাত (displaced communities),
পারিবারিক বন্ধনের বিচ্যুতি (degraded families),
ক্ষুধার্ত-অনাহারক্লিষ্ট মানুষের বিস্তৃতি (increased hunger),
পানির দূষণ (polluted water),
নবায়নযোগ্য সম্পদের ক্ষয় (wasted renewable resources),
মানবাধিকার লঙ্ঘন (human rights violation)।

এসব ব্যয়ের কোনোটিই কল্পিত নয়, সবই বাস্তব। এসব ব্যয়ভার বহন করছেন বর্তমান ও করবেন ভবিষ্যতের প্রজন্ম। ইতোমধ্যে বহুদেশের উপকূলীয় জনগোষ্ঠী এসব ব্যয়ভার বহন করতে শুরু করেছেন। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ক্ষয়-প্রাপ্ত পরিবেশ পুনঃসৃষ্টি করে healthy ecosystem নিশ্চিত করতে আরো অনেকগুণ বেশি ব্যয় করতে বাধ্য হবে। সুতরাং বাণিজ্যিক চিংড়ি চাষকে bad economics বলাই যথেষ্ট হবে না, তা–

পরিবেশগতভাবে আত্মঘাতি (ecologically suicidal),
সামাজিকভাবে নিঃস্বায়ন প্রক্রিয়ার অনুঘটক (socially impoverishing), এবং
অর্থনৈতিকভাবে অন্যায় (economically unjust)।

[৩] দেখুন, Balmford *et.al.* 2002. Economic Reasons for Conserving Wild Nature, *science,* Vol. 297, August 2002: 950-953.